দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 DEC 1998 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

২৪

সংকটে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

মকবুলা পারভীন

কয়েক বছর আগে পিআইবি-তে আয়োজিত এক কর্মশালায় অংশ নিয়ে এর একটি নির্ধারিত কর্মসূচীতে সাভার জেলার একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামটি হতদরিদ্র। ঘর-বাড়ী, জনজীবনে সম্পন্নতার ছাপ নেই। ঘরে ঘরে নাঙ্গা শিশু। এদের এক মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বাচ্চাকে স্কুলে দেননি?' উত্তর হলো, 'না'। কারণ স্কুল অনেক দূরে। আরেক গ্রামে। তাও আবার পেরিয়ে যেতে হয় ঢাকা-চুয়াডাঙ্গা রোড—মানে আরিচা রোড। এ পথ শিশু পার হতে পারে না। বড়দের অনেকেই দ্রুতগামী বাস-ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে মারা যায়।

গ্রামাঞ্চলে শিশুদের স্কুলে নিয়ে যেতে যানবাহনের ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য বা সাথে নিয়ে স্কুলে যাওয়া ও বসে থাকার সময় বাবা-মার নেই। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে স্কুলে যাওয়ার খুব সমস্যা। বর্ষা হলেই রাস্তা ডুবে যাওয়া বা পথের দু'ধারে আখ ক্ষেত ও পাট ক্ষেত থাকায় শিশুদের নিরাপত্তার প্রশ্ন এসে যায়। যদি বড় কোন রাস্তা শিশুদের পারাপারে অসুবিধা হয় তাহলে সে গ্রামে দুটো স্কুলই থাকা উচিত। শহরের পাড়ায় পাড়ায় একাধিক স্কুল থাকে, গ্রামে এভাবে সুযোগ গড়ে উঠেনি। তাই একটি খাল, ভাঙ্গা রাস্তা বা প্রশস্ত মহাসড়ক থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে একই গ্রামে একদিকের ছেলেমেয়েরা সুযোগ পায়, অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা পায় না। গত ২৪ জুন সহযোগী একটি দৈনিকের খবর হচ্ছে, 'পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য শিশু ভর্তি না হবার কারণ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিশুরা ভাঙ্গা বাঁশের সাঁকো আর কাঠের তৈরী জরাজীর্ণ পুল পার হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যেতে চায় না।'

শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা আরও আছে। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় গ্রাম থেকে দূরে কোন মাঠের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি-বাদলাতে গ্রামের স্কুলে ক্লাস হয় না। স্কুল ঘর বলতে জরাজীর্ণ চালাঘর বা বেড়াহীন গোহালের মত একটা কিছু। এ অবস্থায় ঝড়ের আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দেয়া হয় কোন দুর্ঘটনার আশংকা করে। ঝড়ের মুখে ছাত্র-ছাত্রীরা দূরের পথ পার হতে গিয়ে আরও বিপদাপন্ন হয়। তাই প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হওয়া দরকার বসতির কাছাকাছি। এগুলো ইমারত হিসাবে গড়ে তোলাই শ্রেয়।

দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ঘুরলে দেখা যাবে, থানা লেবেল বা বিশিষ্ট প্রভাবশালী গ্রাম ছাড়া আর সব প্রাথমিক বিদ্যালয় এতটাই জরাজীর্ণ যে, ছাত্ররা খোলা আকাশের নীচে লেখাপড়া করে। কোন কোন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা আছে। কিছু কিছু শিক্ষকের জ্ঞানস্বল্পতাও আছে। দু'য়ে মিলে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহালত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনিয়মিত আসা- যাওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ শহরবাসী, কেউ আবার অভিজাত পরিবারের। ফলে দূরান্তের গ্রামে গিয়ে থেকে শিক্ষকতা করা, আসা-যাওয়া করার অসুবিধা আছে। কোন কোন উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকরা উচ্চতর চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ব্যস্ত থাকেন এবং এজন্য প্রায়শঃ ছুটি নিতে হয়। এ অবস্থায় অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হয়।

মাস কয় আগে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পটুয়াখালী জেলার ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ ছাড়াই চলছে। এই বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— পটুয়াখালী সদর থানার ভুঁইয়ারহাট, বগা, পশ্চিম রাজপুর বিদ্যালয়, গলাচিপার পশ্চিম গোলখালী ও পূর্ব চরবিশ্বাস বিদ্যালয়, কলাপাড়ার মধ্য টিয়াখালী ও খাজুরা বিদ্যালয়, মির্জাগঞ্জের উত্তর মাধবখালী ও জনতা ঘোপখালী বিদ্যালয়, দশমিনা থানার রণগোপালদী হাট ও আলীপুরের চয়া নাথ সেন প্রাথমিক বিদ্যালয়। সর্বনাশের কথা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা কি করছেন এতগুলো বছর। আমরা যতদূর জানি, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়া। কিন্তু তা কেবল কথারই কথা। কর্তব্যক্তি থানার সবচেয়ে কাছের বিদ্যালয়ে যদিবা শিক্ষকদের জুজুর ভয় দেখান কিন্তু থানার অন্যান্য স্কুলে তিনি কি সফর করেন? তাই যদি হত তবে পটুয়াখালী জেলার ১৩টি স্কুল ১৩ বছর প্রধান শিক্ষকহীন চলছে, বিদ্যালয় পরিচালনায় অচলাবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে এক যুগেরও বেশী সময় ধরে ব্যাঘাত হচ্ছে এসব ব্যাপারে মোটেও পদক্ষেপ নেয়া হয়নি কেন?

দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার দুর্গতি চলছে। পড়ার বিনিময়ে খাদ্যসূচীতেও অনিয়ম চলছে। কোন কোন স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাদ্যের নমুনাই দেখেনি বলে অভিযোগ আছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষক পদ শূন্য, শিক্ষা উপকরণের অভাব, আসবাবপত্র, চেয়ার-বেঞ্চ, নলকূপ, শৌচাগার নেই— চরম অবহেলায় শিক্ষার ব্যাপারে নিরুৎসাহিতা দেখা দিচ্ছে। বেশীর ভাগ স্কুলেই শিক্ষকদের গরহাজিরার বিষয়টি বেশী লক্ষ্য করা যায়। নির্ধারিত সময়ের আগে স্কুল ছুটি দেয়া, শ্রেণীকক্ষের কাজ ফেলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, পঞ্চায়েতি, স্কুলে গল্পগুজব, ধূমপান, ছাত্ররা প্রশ্ন করলে অমানুষিক প্রহার, বা 'পড়ে নিস' ধরনের উত্তর— ইত্যাদি প্রচুর অভিযোগ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় এবং এগুলো রিপোর্ট আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়েছে। স্মরণযোগ্য যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব শিক্ষককে সরকারী চাকরির মর্যাদা দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় তাদের দীর্ঘদিনের দৈন্যদশা ঘুচে যায়। কিন্তু গ্রাম্য স্কুলগুলোর দৈন্য আজও কাটলো না। বরঞ্চ আগে শিক্ষকদের মধ্যে যে আন্তরিক আগ্রহ ছিল তা ধীরে ধীরে অদক্ষতার আড়ালে সুপ্ত হতে শুরু করেছে।

এক কথায় কর্মউদ্দীপনাহীন-সমস্যাভারাক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষার হালটা 'লেজেগোবরে' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। অথচ স্বাধীনতার ২৭ বছর পরও একে আশাব্যঞ্জক স্তরে পৌঁছানো যায়নি। সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমানটা ভালো অবস্থানে নেই। ভবিষ্যৎ কি, তা বলা যায় না। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও জানেন, দেশে ১২০৭টি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের এবং ৬৬৬৩ স্কুল শিক্ষকের পদ শূন্য। এরপরও কালক্ষেপণ মানে প্রাথমিক শিক্ষার কাংক্ষিত মান অর্জনে ব্যর্থতা। আশা করি, কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আরও ভাল বুঝেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকার আশিভাগ লোক শিক্ষিত, ভারত প্রাথমিক শিক্ষাকে মর্যাদাকর অবস্থানে নিয়ে গেছে— আমাদের পিছু হটা কি মানায়? 'জাতির বিবেকের কাছে' এই প্রশ্নই আজ রাখছি। শিক্ষাক্ষেত্রের বিরাজমান সংকটগুলো দূর করতে কর্তৃপক্ষের বেশী বেশী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আজ গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা 'দরিদ্রপ্রপীড়িত জনগণের সন্তানদের শিক্ষা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্রদের কাছে দারিদ্র্য মুখ্য, শিক্ষা গৌণ। কাজেই জনগণের দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগের সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ সংযোজিত হলে বেশ সাড়া পাওয়া যাবে।